প্রয়াণ

'নিবোধত' পত্রিকার প্রথম এবং এ-যাবৎ সম্পাদিকা প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণামাতাজীর (৭৮) জীবনাবসান হয়েছে রামকৃষ্ণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে, গত ২০ নভেম্বর ২০২০, সকাল ১০-২০ মিনিটে।

মাতাজীর পূর্বনাম শুভময়ী, অপভ্রংশে সুমিত্রা। জন্ম ১৯৪২ সালে, বারাসাতের বিখ্যাত ঘোষাল বংশে। এ-বংশের স্বামী শিবানন্দজী মহারাজ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ। সুমিত্রার পিতা সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল ছিলেন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ বিনয়কুমার সরকারের একান্ত প্রিয় ছাত্র এবং ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। পড়াশোনা-অন্তঃপ্রাণ, সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন মানুষটি ছিলেন স্বামী শংকরানন্দজীর আশ্রিত। প্রসঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। সুবোধকৃষ্ণের প্রাণায়াম করার খুব অভ্যাস ছিল। একবার কার্যব্যপদেশে অনেকদিন ট্রেনযাত্রা করতে হওয়ায় তিনি ট্রেনেই প্রাণায়াম করতে থাকেন। কয়েকদিন পর তাঁর কানে এক সোঁ সোঁ আওয়াজ শুরু হয় যা কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুদিন পর তিনি জয়রামবাটী গেলেন। সেখানে তখন শংকরানন্দজী রয়েছেন। তিনি শিষ্যকে দেখেই পুণ্যিপুকুরে স্নান করতে আদেশ করলেন। পুকুরে ডুব দেওয়ামাত্র সুবোধকৃষ্ণের কানের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। মহারাজ তাঁকে বললেন, ''চলন্ত ট্রেনে প্রাণায়াম করতে গেলে কেন?'' বলা বাহুল্য, প্রাণায়াম বা সোঁ সোঁ শব্দ নিয়ে কোনও কথাই সুবোধকৃষ্ণ ইতিপূর্বে গুরুকে বলেননি। তিনি পরে বলতেন, সেদিন এভাবে গুরুকৃপা লাভ না করলে তাঁর মস্তিষ্কবিকৃতি বা গুরুতর ক্ষতি হয়ে যেতে পারত।

সুমিত্রার জননী বিদুষী শান্তিপ্রিয়া তাঁর মেধার জন্য অধ্যাপকদের প্রিয় ছিলেন। মাতাজী সকৌতুকে স্মরণ করতেন, প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়বার সময় জনৈক বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁকে বলেছিলেন, ''তুমি শান্তির মেয়ে? শান্তির মতো আর ইংরেজি লিখতে হচ্ছে না বাপু!'' বিবিধ বিষয়ে শান্তি দেবীর ছিল গভীর জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসু মন। বেদান্তপ্রাণাজী একবার কথাপ্রসঙ্গে অরুণাচলপ্রদেশে সারদা মঠের কেন্দ্র স্থাপনের কথা মাকে জানালে, শান্তি দেবী তৎক্ষণাৎ স্মৃতি থেকে সেখানকার যাবতীয় ইতিহাস-ভূগোল গড়গড় করে বলে যান। একইসঙ্গে তাঁর ছিল সাংসারিক বিষয়ে অদ্ভুত নিরাসক্তি। তাঁর একশো ভরি সোনার গহনা চুরি হয়ে গেলে অন্যদের আক্ষেপ শুনে বলেছিলেন, ''কী আর হয়েছে! ও তো পড়েই ছিল।'' পরে শত অভাবেও তাঁর মুখে সেই সংক্রান্ত কোনও কথা আর শোনা যায়নি। মাতাজী সবসময় বাবা-মাকে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করতে, বিশেষত শেক্সপিয়র-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-রবীন্দ্রনাথ নিয়ে কথা বলতেই শুনেছেন। তাঁরা উভয়েই ছিলেন দয়ালু। আত্মীয়-অনাত্মীয় নিরাশ্রয় বহু মানুষ তাঁদের পরিবারভুক্ত ছিলেন। সকলের ভরণপোষণ হত পিতার একক আয় থেকেই। এই বিশাল পরিবারের সেবার ভার

সানন্দে বহন করতেন শান্তি দেবী। তাই নিজের সন্তানদের প্রতি পৃথক মনোযোগ দেওয়ার অবকাশ তাঁর কোনওদিনই ঘটেনি। তাঁর রচিত ও সুরারোপিত বেশ কিছু গান ও স্তব আজও সারদা মঠে গীত হয়।

সুমিত্রার পড়াশোনা প্রথমে স্থানীয় বেলুড় হাইস্কুলে, পরে ক্লাস এইট থেকে নিবেদিতা স্কুলে, আবাসিক ছাত্রীরূপে। প্রধান শিক্ষিকারূপে পেয়েছিলেন ব্রহ্মচারিণী লক্ষ্মীদি (প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণামাতাজী), চামেলিদি (আনন্দপ্রাণামাতাজী, বর্তমান সহাধ্যক্ষা), বীণাদিকে (বিশুদ্ধপ্রাণা-মাতাজী)। লক্ষ্মীদির তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পর্কে একটি কথা বেদান্তপ্রাণাজীর প্রায়ই মনে পড়ত। ক্লাসরুমে ঢুকতে ঢুকতে লক্ষ্মীদি নিজস্ব অননুকরণীয় ভঙ্গিতে উচ্চারণ করছেন—"Sumitra minus Sumitra's mind is present in this class"। এমনটি প্রায়ই হত। বেদান্তপ্রাণাজী কোনওদিন বুঝতে পারেননি, লক্ষ্মীদি কোনওদিকে না তাকিয়েই কী করে বুঝতেন সুমিত্রা সত্যিই অন্যমনস্ক। জীবনসায়াহ্নে লক্ষ্মীদি যখন মঠাধ্যক্ষা আর অন্যমনস্ক ছাত্রীটি নিবোধত-র সম্পাদিকা, তখন লক্ষ্মীদি বলতেন, "আমার কাছে আসবে, তোমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগে।"

বেলুড় মঠের কাছে বাড়ি হওয়ায় সুমিত্রা আশৈশব মঠে যাওয়ার সুযোগ পান। স্বামী বিশুদ্ধানন্দ মহারাজের আশ্রিত হলেও তিনি বিশেষ স্নেহ লাভ করেন স্বামী বিমুক্তানন্দজী, অসঙ্গানন্দজী, ভরত মহারাজ, সূর্য মহারাজ প্রমুখের। বিশেষত সূর্য মহারাজ সম্পর্কে একটি মজার কথা উল্লেখ করা যায়। বিকেলে মহারাজ যখন দর্শন দিতেন, কলেজ থেকে ফিরে সেইসময় সুমিত্রা মঠে যেতেন এবং মহারাজের কাছে মনের কথা উজাড় করে বলতেন। মহারাজ তাঁকে একপাশে বসিয়ে, টুপির সেদিকের অংশ তুলে দিয়ে কানটি বের করে বলতেন, "যা বলবি বলে যা, সব শুনছি।" অবশিষ্ট কানটি অন্য ভক্তদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

সংস্কৃতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে সুমিত্রা সারদা মঠে যোগদান করেন ১৯৬৬ সালে। সেদিন ছিল দশহরা, গঙ্গাপূজার পুণ্যতিথি। মঠে তখন রয়েছেন প্রথম অধ্যক্ষা প্রব্রাজিকা ভারতীপ্রাণা-মাতাজী, প্রথম সম্পাদিকা মুক্তিপ্রাণামাতাজী, দয়াপ্রাণামাতাজী, বিদ্যাপ্রাণামাতাজী প্রমুখ। তাঁদের সস্নেহ তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠতে থাকে সুমিত্রার জীবন। যোগদানের দিনটির স্মৃতি তাঁর মনে আজীবন অমলিন ছিল। সেদিন ভারতীপ্রাণামাতাজী ও মুক্তিপ্রাণামাতাজী হাসিমুখে তাঁকে বলেছিলেন, "Welcome welcome"। ভারতীপ্রাণামাতাজীকে, অন্যান্য সকলের সঙ্গে তিনিও পেয়েছিলেন একান্ত আপন করে, জননীর মতো। মঠের সকলের কাছে তিনি ছিলেন 'মা'। সুমিত্রাকে মা বলেছিলেন, "তুমি যখন ঠাকুরপুজো করবে, রোজ গঙ্গাস্নান কোরো।" বলা বাহুল্য, মা নিজেও নিত্য গঙ্গাস্নান করতেন। বহু বছর পর যখন সত্যিই সুমিত্রা ঠাকুরপূজার দায়িত্ব পান, তখন মায়ের নির্দেশ স্মরণ করে একদিনও গঙ্গাস্নান বাদ দেননি—সে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত যাই হোক না কেন। মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিনীরা সকৌতুকে স্মরণ করেন, সুমিত্রাকে নিবেদিতা স্কুলে পাঠানো হলে মায়ের মনোভাব ছিল—এত বিদ্বান মেয়ে কিনা স্কুলে ছোট মেয়েদের পড়াতে গেল! পরে সুমিত্রা বিদ্যাভবন কলেজে পড়াতে গেলে মা খুশি হন। তাঁর মুখে সুমিত্রা এ-যাবৎ অপ্রকাশিত একটি ঘটনা শুনেছিলেন : "উদ্বোধনে থাকতে একদিন বাসন মেজে ঘরে রাখতে যাচ্ছি, দেখি মা [শ্রীশ্রীমা] দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। সরতে বলব কী, হঠাৎ দেখি মা অনেক লম্বা হয়ে গেছেন, মাথা চৌকাঠ ছাড়িয়ে আরও অনেক ওপরে উঠে গেছে। দৃষ্টি দূরে প্রসারিত। গায়ের রং জ্বলন্ত তামার মতো। আস্তে আস্তে মা আবার স্বাভাবিক হলেন। পরে আমিও এ নিয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিনি, মা-ও কিছু বলেননি।"

নবাগতা সুমিত্রা একবার গুরুজনদের সঙ্গে

গেছেন বেলুড় মঠে। সূর্য মহারাজ সেদিন জানতে চেয়েছিলেন, ''কে ভগবানলাভ করতে চাও?'' কেউই উত্তর দিতে সাহস পাননি। শুধু সুমিত্রা খুব জোরের সঙ্গে জানান, ''আমি চাই।'' শুনে মহারাজ তাঁকে কাছে ডাকেন এবং খুব জোরে তাঁর মাথাটি নিজের দুই হাঁটুর মাঝখানে বেশ খানিকক্ষণ ধরে রেখে বলেন, ''যাও, হয়ে গেছে।''

১৯৭১ সালে ভারতীপ্রাণামাতাজীর কাছে সুমিত্রার ব্রহ্মচর্য এবং ১৯৭৮ সালে মোক্ষপ্রাণা-মাতাজীর কাছে সন্ন্যাসলাভ। নাম হল প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা। সন্ন্যাসের পর বেলুড় মঠে প্রণাম করতে গেলে তৎকালীন অধ্যক্ষ বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ তিনজন নবীন সন্ন্যাসিনীকে বলেন, ''যার যা ইচ্ছে চেয়ে নাও।'' একজন ভাল কর্মী হতে চান, দ্বিতীয়জন চান ভগবানকে গভীরভাবে ভালবাসতে। বেদান্তপ্রাণা সেদিন চেয়েছিলেন নির্বাসনা।

মুক্তিপ্রাণামাতাজীর একান্ত ইচ্ছা ছিল সারদা মঠের মুখপত্ররূপে বাংলায় একটি পত্রিকা প্রকাশ করার। বেদান্তপ্রাণাজীর উপর তিনি সে-ভার দেন। পত্রিকা প্রকাশের পিছনে বিবিধ বিষয় থাকে—সবগুলিই তখন ছিল অজানা। তাই মুক্তিপ্রাণা-মাতাজী বলতেন, ''মেয়েটাকে আমরা অগাধ জলে ঠেলে দিয়েছি।'' বাস্তবিক, পত্রিকার প্রথম প্রকাশের আগে এবং প্রথম কয়েক বছর কাজের উপযুক্ত পরিকাঠামো না থাকায় লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ, প্রেসের কাজ, বিজ্ঞাপন সংগ্রহ প্রভৃতির জন্য কঠোর পরিশ্রম তাঁকে করতে হয়েছে। সারাদিন বাইরে কাটাতে হত, আহার-বিশ্রামের বালাই ছিল না। সঙ্গে ছিল সকালে ও রাত্রে মঠের রুটিনকাজ, কারণ মঠে তখন লোকাভাব।

১৯৮৭ সালের জুলাই মাসে গুরুপূর্ণিমার দিন প্রথম প্রকাশিত হয় 'নিবোধত'। পত্রিকা হাতে নিয়ে উচ্ছ্বসিত মুক্তিপ্রাণামাতাজী বলেছিলেন, ''বাঃ! লেখা ভাল, ছাপা ভাল, বাঁধাই ভাল—সব ভাল।'' বেদান্তপ্রাণাজী নিজের মেধা, শ্রম, কার্যকরী বুদ্ধি ও যত্ন দিয়ে সু-উচ্চ মানে পত্রিকাকে প্রতিষ্ঠিত করে মুক্তিপ্রাণামাতাজীর স্বপ্ন সার্থক করেছিলেন। দীর্ঘ চৌত্রিশ বছর ধরে মননঋদ্ধ সুখপাঠ্য সম্পাদকীয়ই শুধু নয়, লিখেছেন বহু মূল্যবান প্রবন্ধ। পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত তাঁর 'শ্রীশ্রীমা ও দশমহাবিদ্যা' আজ বহুমানিত গ্রন্থ। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 'প্রচলকথা'ও অতি জনপ্রিয়। ভারতের সনাতন ভাবধারা এতে নির্ভার গদ্যে অতি হৃদয়গ্রাহী ছন্দে পরিবেশিত হয়েছে। শিকাগো ধর্মমহাসভার শতবর্ষে, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সার্ধশতবর্ষে স্মারকগ্রন্থ ছাড়াও বেশ কিছু গ্রন্থ বেদান্তপ্রাণাজীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে যেগুলি বিদগ্ধ পাঠকমহলে মহাসমাদর লাভ করেছে। বাংলার পণ্ডিতসমাজের সঙ্গে তাঁর ছিল প্রাণের যোগ। মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর এই প্রিয় ছাত্রীকে সস্নেহে দিয়েছিলেন দুটি মূল্যবান রচনা—যেগুলি 'নিবোধত' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তী কালে 'উপনিষদের অমৃত' ও 'যোগের কথা' নামে গ্রন্থরূপ লাভ করে। এ-দুটিই আজ বাংলার সারস্বত সমাজে অতি আদরণীয় সম্পদ। সারদা মঠের প্রকাশন বিভাগের যাবতীয় গ্রন্থের পরিকল্পনা, প্রুফ সংশোধন ইত্যাদি নেপথ্য কাজগুলি বেদান্তপ্রাণাজীর নেতৃত্বেই হত।

লেখনীর মতোই, মাতাজীর বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি হত অত্যন্ত মনোগ্রাহী। বিশেষত, বেদান্ত তথা শাস্ত্রীয় বিষয়ে অসাধারণ অধিকার, মধুর বাচনভঙ্গি ও সহজবোধ্য উপস্থাপনা তাঁর ক্লাসগুলিকে করে তুলত অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মঠে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তিনদিন সন্ধ্যারতির পর ভাগবতপাঠ হয়। বহুবছর ধরে মাতাজীর রাসের পাঠ সাধুভক্তদের কাছে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় ছিল। সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যের আগে প্রয়োজনীয় পাঠ দেওয়ার দায়িত্বও

তিনি দীর্ঘকাল পালন করেছেন। সাধুজীবনের অপার্থিব আনন্দ, দায়িত্ববোধ তিনি অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। সঙ্ঘের সকল সদস্যা—যাঁরাই তাঁর কাছে পাঠ নিয়েছেন—প্রত্যেকে সকৃতজ্ঞচিত্তে এই অনুভূতি স্মরণ করেন।

মাতাজী ব্রহ্মচারিণী অবস্থা থেকেই বিশেষ পূজাগুলিতে পূজারিণী অথবা তন্ত্রধারকের ভূমিকা গ্রহণ করতেন। মঠে তিনি বহুদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবাপূজাদি করেছেন। মুক্তিপ্রাণামাতাজীর আদেশে তিনি সূর্য মহারাজ, স্বামী হিতানন্দ প্রমুখের পরামর্শ নিয়ে সারদা মঠের পূজাপদ্ধতিকে একটি নির্দিষ্ট রূপ দেন। পূজা ও দেবসেবা সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রয়োজন হলে তিনি শাস্ত্র ঘেঁটে এবং সংশ্লিষ্ট পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করে উপযুক্ত বিধান দিতেন। দীক্ষা, অশৌচ প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে ভক্তদের কোনও সমস্যায় বর্তমান প্রেসিডেন্ট মাতাজীকে বলতে শোনা যেত—''বেদান্তপ্রাণা যা বলবে তাই হবে।''

মাতাজীর সংগীতপ্রতিভা ছিল সহজাত। যেমন ছিল তাঁর সুকণ্ঠ, উচ্চাঙ্গ সংগীতে অধিকার, তেমনই ছিল তবলা, বাঁশি, মাউথ অর্গ্যান, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে অনায়াস পারদর্শিতা। মুক্তিপ্রাণামাতাজীর নির্দেশে তিনি ভজন, স্তব, গান ইত্যাদির সুর-লয় নির্দিষ্ট করে মঠবাসিনীদের শিখিয়েছিলেন। বহুদিন আরাত্রিক ভজন এবং বিশেষ বিশেষ দিনে গান পরিচালনা করেছেন। বিশেষত দোলের দিন নাটমন্দিরে তাঁর নেতৃত্বে কীর্তন মঠবাসিনীদের কাছে অতি আনন্দের স্মৃতি। সকলকে নিয়ে আনন্দ করে গান করতে তিনি ভালবাসতেন। তবলচি, খঞ্জনিধারী যেমন তাঁর হাসিমুখের উৎসাহ পেতেন, সমান উৎসাহ পেতেন বেসুরো বেতালা-রাও। সন্ন্যাসিনীরা তাই তাঁর নির্ভয় আনন্দময় সান্নিধ্য স্মরণ করে মজা করে বলেন, কোনওদিন যে গান গায়নি সেও বেদান্তপ্রাণাজীর পাশে বসে গলা ছেড়ে গাইতে পারে। প্রসঙ্গত, প্রয়াত সহাধ্যক্ষা অজয়প্রাণামাতাজী বেদান্তপ্রাণাজীর গান এত পছন্দ করতেন যে, তাঁর গাওয়া বিশেষ কয়েকটি গান অন্যেরা গাওয়ার উদ্যোগ করলে থামিয়ে দিয়ে বলতেন, ''বেদান্তপ্রাণার গান কানে লেগে আছে, তা-ই থাকুক।'' সিডনি আশ্রমে সান্ধ্য ভজনের সময় তাঁর নির্দেশমতো বেদান্তপ্রাণাজীর গাওয়া ভজনের রেকর্ড বাজানো হত এবং সকলে সেটি অনুসরণ করে গান করতেন। নিবেদিতা স্কুলে এবং বিদ্যাভবন কলেজে থাকাকালীন তাঁর নির্দেশনায় গান-নাটক ইত্যাদি হত। একবার কলেজছাত্রীদের চৈতন্যদেবের উপর একটি চলচ্চিত্র দেখাতে নিয়ে যাওয়া হলে তারা একটু দেখেই বেরিয়ে আসে এই বলে যে, চৈতন্যদেবের নাটক করাবার সময় সুমিত্রাদি যে-উচ্চভাবের সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তার তুলনায় এ কিছুই নয়।

রান্না ছিল তাঁর আর একটি প্রিয় বিষয়। প্রয়োজনে গুরুজনদের রুচিমতো স্বাস্থ্যসম্মত রান্না করে খাইয়ে তৃপ্ত করতেন। পরবর্তী কালে পত্রিকার লেখক, কর্মী বা ভক্ত—যিনি যখনই আসুন না কেন, বেদান্তপ্রাণাজী কাউকে না খাইয়ে ছাড়তেন না। তাঁর মনোভাব ছিল সকলের ক্ষেত্রেই সমান—স্বনামধন্য গুণিজনের ক্ষেত্রে যেমন, নিতান্ত অচেনা বা নবাগত কর্মীটির ক্ষেত্রেও তেমনই। বলতেন, ''দেখছি মা-ই খাচ্ছেন।''

প্রাচীন সন্ন্যাসিনীরা সস্নেহে তাঁর কর্মক্ষমতার গল্প করেন। বহু মানুষের জন্য রুটি বা বিশেষদিনে লুচির আটা-ময়দার পরিমাপ করা থেকে আরম্ভ করে মাখা, লেচি কাটা, বেলা, ভাজা—তিনি থাকলে কোনও কিছু নিয়েই চিন্তা থাকত না। পরিবেশন বা অন্যান্য কাজের ক্ষেত্রেও তাই। তিনি গাছ, ফুল, পাখি যেমন ভালবাসতেন, তেমনই তাদের নাড়িনক্ষত্র জানতেন। নিতান্ত জংলি গাছের পাতা দেখেও তার নাম ও উপকারিতা বলে দিতেন। এক বহুদর্শী প্রাচীন

ভক্ত বলেন, ''অনেক মানুষ দেখেছি, কিন্তু তাঁর মতো কাউকে দেখিনি যিনি বিভিন্ন বিষয়ে এত জানেন!'' তাঁর উদারতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নিবোধত পত্রিকায় সেবারত পরবর্তী প্রজন্মকে তিনি কাজের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন।

সর্বোপরি ছিল তাঁর মার্জিত, বিনয়ী আচরণ এবং মধুর ব্যবহার। গুণগ্রাহিতা, অপরকে মান দেওয়া, সকলকে আপন করে নেওয়া ইত্যাদি গুণের জন্য সন্ন্যাসিনী-ভক্ত-নির্বিশেষে সকলেই তাঁর প্রতি অন্তরের আকর্ষণ অনুভব করতেন। বহু বছর ধরে লিভারের অসুখ ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। কিন্তু তা তাঁর প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় যেমন ছেদ ঘটাতে পারেনি, তেমনই পারেনি তাঁর মাধুর্যকে কেড়ে নিতে। অতি সাধারণ মানুষের কাছেও তিনি ছিলেন আপনজন। দেহাবসানের মাসদুয়েক আগে এসি সারানোর দুটি ছেলে দুপুরে কাজ করতে এলে তাদের খাওয়াতে শুধু নির্দেশই দিলেন না, অসুস্থ শরীরে তাদের খাবার তৈরিতে যথাসম্ভব সাহায্যও করলেন। সকলের দেহের ও মনের সেবা করবার অদম্য ইচ্ছা তাঁর মনে সর্বদা জাগরূক থাকত। সকলের প্রতি গভীর এই মাতৃস্নেহই ছিল তাঁর জীবনের মূল সুর। একদা দুই ব্রহ্মচারিণী একটি অনভিপ্রেত কাজ করে ফেললে বেদান্তপ্রাণাজী অভিনব উপায়ে তাদের শাসন করেন—একটি সস্নেহ কবিতায় শুভেচ্ছা জানান : ''Innocent kids/ Good mischiefs/ Done amidst/ Frozen fist./ Dear child of light/ Your faces are bright/ A joyful sight/ That gives delight/ My heartiest prayer/ To mother—who is there/ Let children rare/ Immense bliss share.''

সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্যের পর নবীন ব্রতধারিণীরা জয়রামবাটী-কামারপুকুর থেকে ফিরলে সাগ্রহে তিনি অপেক্ষা করতেন, কখন তারা এসে হইহই করে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা বলবে। সেসময় তাঁর ঘরে আনন্দের বন্যা বইত। তীর্থে যাওয়ার আগে যেমন তিনি সন্ন্যাসিনীদের সেই তীর্থমাহাত্ম্য সম্পর্কে সচেতন করে দিতেন, খাওয়া-থাকা নিয়ে চিন্তা করতেন, তেমনই ফেরার পর তাঁদের আনন্দ বহুগুণিত করে দিতেন মূল্যবান আলোচনায়।

কল্যাণচিন্তা ছিল তাঁর সহজাত। গত ২ নভেম্বর হসপিটালে ভর্তি হওয়ার খানিক আগেও সকলের কল্যাণের জন্য সকরুণ প্রার্থনা করছিলেন। দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে তাঁর অশ্রুপূর্ণ ব্যাকুল প্রার্থনা ছিল—''মা, সঙ্ঘকে রক্ষা করো, সমস্ত বিঘ্ন-বিপদ থেকে রক্ষা করো।''

'প্রচলকথা'র সঙ্গে কোথায় যেন জড়িয়ে ছিল মাতাজীর অন্তরের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বিশ্বাস। তাই চিরবাঞ্ছিত মায়ের কোলে আশ্রয়লাভের আগে তাঁর শেষ গল্পটির শেষ পঙ্‌ক্তি : ''এখন মায়ের কাজ, তারপর বিশ্বজননীর স্নেহময় কোল।'' গল্পের নাম দিয়েছিলেন 'মায়ের ডাকে'। আশ্চর্য, দেহাবসানের মাত্র কয়েকদিন আগে যখন তিনি হসপিটালে, মঠে প্রেসিডেন্ট মাতাজী হঠাৎ বলে ওঠেন : ''বেদান্তপ্রাণা মায়ের ডাকে কোথায় চলে যাচ্ছে?''

মাতাজী বলতেন, মহাজীবনের কথা লিপিতে ফোটানো যায় না। তাঁর প্রয়াণসংবাদ লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে একথাটিই বারবার মনে আসছে। প্রসঙ্গত, স্বামী ভূতেশানন্দজী একদা বলেছিলেন, ''বেদান্তপ্রাণা, তুমি বড্ড ভাল। তুমি বড্ড বেশি বেশি ভাল—একশোর ওপর দুশো পার্সেন্ট ভাল।'' ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের অনুভূত মহত্ত্বের ছবি সাধারণ লেখনী আঁকবে কীকরে? বিপুল মাপের যে-মানুষটি এতদিন ধরা-ছোঁয়ার সীমায় ছিলেন, আজ তাঁর পার্থিব দেহ চোখের সামনে নেই। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর অনুপ্রেরণা, কল্যাণচিন্তা, শুভ ভাবরাশি। ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবে প্রদীপ্ত জীবনটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে দৃষ্টান্ত হয়ে রইল। সঙ্ঘের বেদিমূলে সমর্পিত এই সন্ন্যাসিনীর চরণে আমাদের প্রাণের প্রণাম।